এম এ তৃতীয়পত্র ,কথাসাহিত্যবিশেষ পত্র

আশালতা সিংহের গল্পঃ নারী- জীবনের কথকতা

ডঃ অন্বেষা খান
অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর
বাংলা বিভাগ, বেথুন কলেজ

আশালতা সিংহের গল্প পড়লে মনে হয়, এ যেন তাঁর জীবনের গল্প। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নির্যাস বাহিত গল্পগুলি পড়তে গিয়ে নারীচেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ‘আমার স্বচ্ছ শুভবুদ্ধি আমাকে যাহা নির্দেশ করিয়া দিবে আমি তাহাই করিব। বৃথা লোকনিন্দা এবং লোকমতের ভয়ে যে সঙ্গে ও যে আবহাওয়ায় আমার হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা ঘটে সেখানে আমি কিছুতেই থাকিবনা।’ একথা স্বয়ং লেখিকার । গল্পের নারীচরিত্রের ক্ষেত্রে একথা সত্য প্রমাণিত হয়ছে বারবার। লেখিকা ভাগলপুরের মানুষ। ভাগলপুর বলতেই মনে হয় এ স্থান বঙ্গীয় সংস্কৃতির উৎসভূমি। শরৎচন্দ্র,বনফুল,বিভূতিভূষণ প্রমুখের সঙ্গে এই স্থানের আত্মার সম্পর্ক। ভাগলপুর ছাড়া অন্যত্র কাটিয়েছেন লেখিকা। তবে শিল্প-সাহিত্য অনুরাগী পিতার স্নেহানুকূল্যে আবাল্য বিকশিত হয়েছিল তাঁর প্রতিভা।রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপকে একরকম উপেক্ষা করে গেছিলেন তিনি। অল্প বয়সেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি শেলি কীটস বায়রন ও তাঁর পড়া হয়েগেছিল।বাংলা সাহিত্যে যখন কল্লোল কালিকলম প্রগতি পত্রিকার বিকাশ ঘটে তখনই তরুণী আশালতার আবির্ভাব । আশালতা সিংহ এর সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে তেমন আলোকপাত কেউ করেননি বলা যায় । স্বাভাবিক অন্যান্য নারী লেখিকাদের নিয়ে তোমাদের মনে কৌতূহল জন্ম নিলে নিচের লিঙ্কটি থেকে তোমরা সাহায্য পেতে পারো ।

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Women_writers_from_West_Bengal

জীবনে মূল্যবোধের বিশ শতকীয় ‘বিশ্বাস ভঙ্গের’ সার্বিক প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে ‘কালিকলম’ ও ‘প্রগতি’ পত্রিকায় । বাংলা সাহিত্যে তরুণী আশালতার আবির্ভাব ঘটে এইসময়ে। ১৯৩০-৩১ এর আর্থিক মন্দা , দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি, দেশের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য বিচিত্র আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য তৎপরতা, আগস্ট আন্দোলন ,প্রভৃতি কারণে দেশ তোলপাড়। এই সংকটের মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রা। ঐতিহাসিক কারণেই গত ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসেছিল পরিবর্তমানের হাওয়া ।এর অন্যতম একটি বিষয় ছিল সমাজে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তন । এই সময় থেকেই গুরুত্ব পেতে থাকে নারীর স্বাধিকার তথা আর্থিক স্বাধীনতা । তাঁর একাধিক গল্পে- উপন্যাসে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় । আশালতা সিংহের ব্যক্তি-জীবন নিয়ে একটি ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া হল।

https://www.youtube.com/watch?v=KJBofv1O9Ec

ব্যক্তিগত জীবনে পুরুষতান্ত্রিক প্রথাধীন জীবনের যন্ত্রণা তিনি সয়েছিলেন। এসবের দ্বারা তাঁর মন আরও পরিণত হতে থাকে। ব্যক্তিক সংকট যখন সমাজের সংকট হয়ে ওঠে তখন তিনি নিজেকেই ফিরে দেখতে চান তাঁর লেখায়। মূলত নারীজীবনের সমস্যার আধারেই রচিত তাঁর গল্পগুলি।তবে এসব গল্প লিখতে গিয়ে ফ্রয়েড, ইয়ুং, সিমন দ্য বভেয়ার লেখা পড়েছিলেন কিনা তা স্পষ্ট না জানা গেলেও পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস দর্শনে তাঁর অনায়াস যাতায়াত ছিল। আত্মসম্মান রক্ষার লড়াইয়ের কাহিনী সেলায়ের কল গল্পটি। এই গল্পে নারীপুরুষের বাস্তব সম্পর্কের ছবি উঠে আসে। সেলাইয়ের দিদিমণি হয়ে অণিমা আসে সুরবালার বাড়িতে। রক্ষণশীল পরিবারের গৃহিণী সুরবালা তার সতীত্বের অহঙ্কারে অলঙ্কৃত। তার ডেপুটি স্বামী তার একমাত্র আশ্রয়। তারই পরামর্শে এই সেলাই শেখার হুজুগ। স্বামীর বদলির চাকরিতে বারবারই তাদের স্থানান্তরে যেতে হয়। সারাদিন স্বহস্তে সংসারের সব পরিপাটি করে রেখে নিজের একাকীত্ব মুছতেই অণিমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। এর আগে পর্যন্ত গল্পে ধীর গতিতে কাহিনী এগিয়েছে। নিপুণ পারিপাট্যে সুরবালা তার সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে।পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কোন ত্রুটি নেই কোথাও। এজন্য তার ডেপুটি স্বামীও অত্যন্ত গর্বিত। নিজহাতে আরামকেদারায় তৈল প্রলেপ নিবারণের জন্য কুশনে কারুকার্য করেছে। সেলাইয়ের প্রতি সুরবালার আগ্রহ দেখে তার স্বামী একটি সেলাইয়ের মেশিন কিনে দেন। কারণ তার যুক্তি ‘আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে যে কাজ সহজে অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে হয় সে কাজে অনর্থক অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরকারটা কোনখানে? এরপর মেশিনের সঙ্গে সঙ্গে সেলাইয়ের দিদিমণি

আসে বাড়িতে। তিনি অণিমা গুপ্ত। এই মহিলাই গল্পের নায়িকা। সে সুরবালার সতীত্বের বিশ্বাস সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে। অণিমা গুপ্তের সঙ্গে আলাপ হয়ে সুরবালার ভালোই লেগেছিল। তার বয়স কম, বোধ হয় বাইশ-তেইশ, পরনে তার ছাই রঙের শাড়ি। অতিশয় সুন্দরী না হলেও সুশ্রী বটে। বেশভূষায় পারিপাট্য আছে। যে মেয়েকে চাকরি করে জীবিকার সংস্থান করতে হয়, সুরবালা তার মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রত্যাশা করে। কিন্তু চঞ্চলতা আর প্রগল্ভতাই তার চোখে - মুখে প্রতিফলিত। সুরবালা ও অণিমার মধ্যে সামাজিক অবস্থানগত বৈষম্য লক্ষণীয়। দুজনের মূল্যবোধের মধ্যেও ফারাক অনেকটা। ধীরে ধীরে তাদের সখ্য জমে ওঠে। আর সুরবালাকে অণিমা দেখে ফিরোজা রঙের সঙ্গে কম্বিনেশনে শান্তিপুরের শাড়িতে মুখের হাসিমাখা ভাবে , সাংসারিক সুখের ছায়া পড়েছে ।এ বাড়িতে আসার পর থেকেই সে লক্ষ্য করেছে আতিথেয়তার আন্তরিকতা। বাঙালি পরিবারের বধূদের সেলাই শেখানো তার বিড়ম্বনা মনে হয়। কারণ তাদের কাছে এই বিষয়টি গৌণ। সাংসারিক নানান ব্যস্ততার মধ্যে নিজেদের শখ পূরণ করা বাড়ির মা-বউ দের কাছে নেহাতই অকল্পনীয়। লেখিকা এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের মেয়েদের অবস্থানটি বোঝাতে চেয়েছেন। এই সমস্যা আজও দূরীভূত হয় নি। এদের থেকে সুরবালার অবস্থান দূরবর্তী। সে যেকোনো বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী। অবশ্য গল্পে সুরবালাকে আমরা মা রূপে দেখিনি, বধূ রূপেই তার একমাত্র পরিচয়। সঙ্গীহীন প্রবাসে সুবেশা হাস্যমুখী অণিমাকে তার বেশ লাগে। সেলাই শেখার সঙ্গে সঙ্গে নানা সুখ-দুঃখের গল্প হয় তাদের মধ্যে। বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয় ক্রমশ । সুরবালা জানতে পারে অণিমা ও তার স্বামী একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। তবে , তার স্বামী বেকার, সংসারের বোঝা তারই কাঁধে। অতিরিক্ত অর্থও অণিমা পেত সুরবালাকে আরও বেশি সময় শেখানোর বিনিময়ে। গল্পের কাহিনীর ডিটেলিং লক্ষ্য করার মতো। এত ধীর লয়ে এগিয়ে চলা গল্পটি পড়তে পড়তে সেই সময়ের সমাজে মেয়েদের অবস্থানটি চেনা যায়। এখানে বলে রাখা ভাল, লেখিকা নিজে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে গল্প উপন্যাস লিখেছেন।

সুরবালা লক্ষ করে অণিমার স্বামী বেকার হলেও তার প্রতি যত্নশীল। বৈশাখের বিকেলে ঝড় জলের কারণে নিতাই সঙ্গে করে নিয়ে যায় অণিমাকে। উদ্দেশ্য যে শুধু স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া নয়, তা সুরবালার বোধগম্য হয় নি। সুরবালা প্রশংসার চোখে দেখে নিতাইকে- 'আমাদের ভাগ্যে ভাই বরাবর উল্টো হয়ে এসেচে। কর্ত্তারা কাজে গেলে মেঘ জলের উপক্রম দেখলে আমরাই ভয়ে ভাবনায় থাকি। আমাদের জন্যে কখনো কাউকে ভাবতে হয়নি।' সুরবালার এই ভাবনায় অণিমার অবস্থান অনেক উঁচুতে মনে হয়। কিন্তু গল্পের শেষে বোঝা যাবে প্রকৃত সত্যটি কী? সুরবালা নিজের গৃহিনীপনায় নিতাইকে যথাযথ আপ্যায়ন করে, বৃষ্টির সময় গাড়ীতে করে বাড়ি পাঠায়। অণিমাদি জানে নিতাইয়ের স্বরূপ। সুরবালার বন্দোবস্ত করে দেওয়া গাড়িতে যেতে যেতে নিতাই আরাম করে হেলান দিয়ে বলে – 'তোমার ছাত্রী খাসা দেখতে ! বাঃ , রূপের জৌলুষ এমন যে, দু'দশ মিনিট তাকিয়ে দেখতে হয়। ' নিতাইয়ের নারী- লোলুপতার দিকটি অণিমা ঘৃণার চোখে দেখে। অণিমা নিজেই অসম্মানিত বোধ করে। এত অপমান কি তার প্রাপ্য হতে পারে? পুরুষের এই প্রবৃত্তির কাছে নারী অসহায় চিরকাল । নিতাই বোঝেনি তার কথা অণিমাকে কতটা আহত করতে পারে। অণিমা নিরুত্তর থাকে, এসব কথার কোনও উত্তর দেয় না।এরপর যখন সে বাড়িতে ফিরে সংসারের সবকিছু বিশৃঙ্খল দেখে অস্থির হয়ে পড়ে, তখন নিতাই তাকে কঠিন বাক্যবাণে বিদ্ধ করে। সারাদিন বাড়িতে বসে থেকে নিতাই তাকে কোনোভাবে সহায়তা করে না, উপরন্তু তার থেকে সাংসারিক নিপুণতাও প্রত্যাশা করে। মেয়েদের দায়িত্ব- জ্ঞান আর পুরুষের দায়িত্ব জ্ঞান আর পুরুষের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতাই পাঠকের চোখে পড়ে। নির্লজ্জ আয়েসী ভঙ্গিতে সে বলে- ' তোমার ঘরকন্নার কাজ আমাকে করে দিতে হবে না কি? দু'পয়সা উপার্জন করতে শিখলেই মেয়েদের এমনই বাড় হয় বটে।' এসব কথা অণিমাকে যন্ত্রণা দিত। তবু সবই সে সহ্য করেছে। অণিমা নিতাইকে আশ্রয় দিয়েছে, তাকে পালন করেছে। নিতাইয়ের কদর্যতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে কোন উপায় ছিল না অণিমার। সুরবালার বাড়িতে প্রতিদিন হাজির হয়েছে নিতাই যে কোন অছিলায়। সুরবালার হাস্য-পরিহাসের কোন উত্তর দিতে পারেনি অণিমা। নীরবে আড়ষ্ট হয়ে থেকেছে সে। সুরবালার সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু শিক্ষক- ছাত্রীর ছিল না। তাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট মধুর। তার মধ্যে ক্রমশ বিতৃষ্ণা এল। সুরবালার আহ্লাদ, রসিকতা কোনটাই আর স্বান্তনা দিতে পারল না অণিমাকে। নিতাইয়ের নির্লজ্জতায় সুরবালার কাছে নিজেকে তার নীচ বলে মনে হল। ' নিতাই বয়সে তরুণ নয়, দেখিতে প্রিয়দর্শন নয়, তবু স্ত্রীর জন্য তাহার এই ব্যগ্র অধীরতা , প্রেমের এই অদর্শন - অসহনীয়তা তাঁহার ভারি মিষ্ট লাগিল। ' কিন্তু অণিমার মোটেই এসব পছন্দের ছিল না। সুরবালার হাসিতামাশা যেন তার অসহ্য বোধ হচ্ছিল। কারণ নিতাইয়ের নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় সে আগেই পেয়েছে। সুরবালার কাছে সে সবই অজানা ছিল। নিতাইয়ের আকস্মিক আগমন অনেক সময় অণিমার পক্ষে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়াত। পরের দিন অণিমা বুদ্ধি করে সকালবেলায় এসে হাজির হয় । নিতাইয়ের কাজকর্মের বিরুদ্ধে অবরোধ গড়ে তোলাই তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সুরবালার দৈনন্দিন কাজকর্ম থাকায় সম্ভব ছিল না সকালবেলায় সেলাই শেখা। তাই সে খানিকটা অসন্তুষ্ট হয়। সুরবালার হাসি তামাশা কোনোকিছুই আর মনোগ্রাহী হত না অণিমার। এর পরেই আকস্মিক চাকরিটা ছেড়ে দেয় সে। এই ঘটনায় নিতাইয়ের প্রচণ্ড আক্রোশের মুখে পড়তে হয় তাকে। বেকার পরজীবী নিতাইয়ের পরস্ত্রী- লোলুপতা সহ্য করতে পারেনি সে। নিতাই অর্থনৈতিক কারণ দেখিয়ে তার চাকরি ছাড়ার কৈফিয়ত চাইলে, অণিমা তার নির্লজ্জতার যথেষ্ট জবাব দেয়। 'স্ত্রীলোকের উপার্জনে দিব্য দিনের পর দিন কেমন করে আরামে আছ, আমি যখন ভাবি, তখন অবাক হয়ে যাই। … কিন্তু অমন কাজটাও শেষে তোমার জন্যে ছেড়ে দিতে হল।' নারীর প্রতি পুরুষের যে কোন সহানুভূতি নেই, তার প্রতি সমীহ নেই, নেই নিজ আত্মসম্মানবোধ যা দিয়ে সে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে। অণিমাদের যন্ত্রণা কষ্ট বোঝার মত কোন মন নেই

কারও। এদের নিঃসঙ্গতা আরও মর্মান্তিক। নিতাইয়ের কাছে অণিমার প্রাপ্তি শুধুই অসম্মান,- ‘ওঃ , তেজের বহর দেখ! কেন তুমি কি আমার বিয়ে করা পরিবার যে তোমাকে সম্মান করে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাওয়াতে হবে ? ··· ওরে আমার সতীলক্ষ্মীরে , ওনাদের আবার ঈর্ষা ! ’ আর এক নগ্ন সত্য উঠে আসে পাঠকের সামনে। এই সত্য এতদিন সুরবালারও অজানা ছিল। সমাজে যে এদের অবস্থান কোথায় তা আমাদের কাছে স্পষ্ট। বিবাহ- বহির্ভূত প্রেম যে সমাজের চোখেই শুধু কলঙ্কিত তাই নয়, সেখানে নারীপুরুষের পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে ওঠে না, একে অন্যের হৃদয়ের স্পর্শ পায় না। যে সম্পর্কে কোন সত্যতা নেই, সেখানে কোন সম্মান নেই, কোন প্রেম নেই, প্রীতি নেই। তাই অণিমার বঞ্চিত হৃদয়ের অশ্রু নিষ্ফলতার দিকে যাত্রা করে। অথচ অণিমার মনে কোন পাপ বা ক্লেদ ছিল না, যা নিতাইয়ের মধ্যে দেখেছি। পরোক্ষে অণিমাকে ব্যবহার করে নিতাই পরজীবীতার যে দৃষ্টান্ত রেখেছে, তা ঘৃণ্য, নিন্দনীয় । ‘অপমানে বেদনায় অণিমার মুখ পাংশু হইয়া গেছে। নিষ্প্রভ দুটি চোখের কোল বাহিয়া অন্ধকারে অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।’ সুতরাং ট্র্যাজেডি প্রকৃতপক্ষে অণিমার।

সুরবালা তার স্বামী হরকুমারের কাছে অণিমা-নিতাইয়ের প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে। দেশের বাড়িতে নিতাইয়ের চির-রুগ্ন স্ত্রী আজও বেঁচে থাকায় অণিমার সঙ্গে তার বিধিবদ্ধ ভাবে নৈতিক বিবাহ হয়নি। এই সত্য সুরবালাকে একরাশ অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত করে। সে তার গার্হ্যস্থ্যজীবনে পবিত্রতা শুচিতা বজায় রাখতে চায়। নিতাই বৈঠকখানায় তার স্বামীর আরামকেদারায় বসে বিশ্রাম করেছে, চা পান করেছে-- এসব কথা ভেবে সুরবালার নিজেরই বিবমিষা জন্মায়। কীভাবে সে তার যত্নের সংসারে এত ভুল করে ? অণিমার নিজের পরিচয় ছিল সে খ্রীশ্চান, সে কারণে প্রথমে তার প্রতি বিতৃষ্ণা থাকলেও পরে তাকে গ্রহণ করে। রক্ষণশীল ভাবনা থেকে সুরবালা বলে – ‘কিন্তু হ্যাঁগো , শুধু আমারই তো নয়, এমন করে ঠকিয়ে সে আরও কত ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকেছে।’ সুরবালার অনাধুনিক প্রথাগত দৃষ্টিতে অণিমাকে ঠক, প্রতারক বলে মনে হলেও তার থেকে নিতাইয়ের অবস্থান আরও অনেক নিচে। সেকথা সুরবালার মনে হতে দেখি না। সে রক্ষণশীল গৃহবধূর মতো শুধু নিজের ঘরের শুচিতা রক্ষা করে। এমনকি অণিমা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে জড়িত সেলাই মেশিনটিকে সে বাড়ি থেকে অপসারিত করতে চায়। নিজের শখ - সাধ সবই সে বিসর্জন দিতে মনস্থ করে । আর হরকুমার প্রথমে তার সিদ্ধান্তকে অতিরঞ্জন মনে করলেও পরে সম্মতি জানায়। বিবাহের পূর্বে সুরবালার চরকায় সুতো কাটা পরোক্ষে আশালতার বিবাহ পূর্ব জীবনের কথা স্মরণ করায় । ‘ হরকুমার মুখে বলিলেন , ‘যাও - এ আবার তোমার বাড়াবাড়ি ।’ কিন্তু মনে মনে খুসী হইলেন। সাধ্বী স্ত্রীদের অবিচলিত নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া মস্তক নত করিলেন।’ অর্থাৎ সতীসাধ্বী স্ত্রীলোকের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

মঞ্জরীর বেহায়াপনা গল্পটি (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) নারী পুরুষের অবৈধ প্রেম নিয়ে লেখা। দিদি ও জামাইবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে শিমূলতলায় বাড়িওয়ালা নরেশ বাবুর সঙ্গে তার আলাপ। প্রথমদিন তার থেকে পাওয়া ;চমৎকার ফুলের কথা ভুলতে পারেনি মঞ্জরী । প্রকৃতির নিভৃত আবেষ্টনী উভয়ের প্রেমকে আরও প্রগাঢ়তা দেয়। 'শিমূলতলার নির্জজন পার্বত্য প্রকৃতি , বনময় আবেষ্টন , ফাল্গুনের ঈষদুষ্ণ বাতাস, আকাশের ঘননীল – এ সমস্তই একযোগে মঞ্জরী ও নরেশের চিত্তকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল।' কিন্তু তাদের সম্বন্ধ হবে অসবর্ণ ও বৈষম্যের । তাই মঞ্জরীর বাবা তাতে রাজি নাও হতে পারেন। এমন আশঙ্কা তাদের ছিলই। কিন্তু শেষঅবধি মঞ্জরীর বাবা কন্যা সম্প্রদান করেন। এই সিদ্ধান্তে তার উদারমনের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতপাতের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধে তিনি। কিন্তু তার মতো বিচক্ষণ মনের মানুষের কাছে সমাজ এটা প্রত্যাশা করে না। যদিও সুরসুন্দর এসবকিছু উপেক্ষা করে তরুণ তরুণীকে নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। কিন্তু তাদের প্রেমের আতিশয্যে একটা নিন্দার গুঞ্জন ছড়াতে থাকে। মহিলা সমিতিতে সে বিষয়ে কলরব ছড়াতে থাকে। নানাস্থানে নরেশ ও মঞ্জরীকে দেখা যায় , তাদের আবেগের মুহূর্তগুলো অনাবৃত হয়ে পড়ে লোকচক্ষুর সামনে। সমাজের নৈতিক বিধিনিষেধের কাছে এদের কোন সম্মান নেই, স্বীকৃতি নেই। সমিতির অন্যতম ব্যক্তিত্ব সরমা টিপে হেসে বলে ' টিলার উপর বসে সেই দুই মূর্তি ।' এই ব্যঙ্গোক্তির আড়ালে আছে না - পাওয়ার দীর্ঘ নিঃশ্বাস। এক ধরনের হতাশা লুকিয়ে থাকে এর আড়ালে। শুরু হয় নরেশ ও মঞ্জরীর চারিত্র্য ব্যাখ্যান, রুচিহীনতা, অশালীনতা, নিয়ে নানা কথা। সমাজের গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান লোকেদের কথায়- ' মঞ্জরীর বাপকে আমরা বরাবর ধীর স্থির বিবেচক বলে জানতুম। তিনি যে হঠাৎ এমন অসামাজিক একটা বিবাহ দেবেন, রাঢ়ী বারেন্দ্র একাকার হয়ে চলৎ হয়ে যাবার পক্ষে সাহায্য করবেন,তা কে মনে করেছিল?' অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে যে জল-অচল ব্যবধান ছিল, সে সবই যে সহজে উপেক্ষা করা যায়, এই ভাবনা সমাজের কাছে নতুন, এবং অসম্ভব প্রায়। তাই সহজে এটা

গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আশালতা দেবীর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তিনি প্রথাগত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। সেই বিদ্রোহের আর প্রতিবাদের গল্প মঞ্জরীর বেহায়াপনা গল্পটি। নামকরণের মধ্যে শ্ল্যাং শব্দের ব্যবহারের লক্ষ্য বস্তুত পক্ষে সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো । যদিও সে অনেক শতাব্দীর মনীষির কাজ।

অসবর্ণ বিবাহে সম্মতি জানানোর দায় একা সুরসুন্দর বাবুর নয়, তিনি যদি পিতৃত্বের কঠিন শাসনে মেয়ের বিবাহে অসম্মতি জানাতেন , তবে তা উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরাত। মাতৃহীন কন্যাকে তিনি আর যন্ত্রণা দিতে চান না। বাৎসল্যের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেন সুরসুন্দর। সমিতির মহিলাদের আলোচনায় শোনা যায় 'মাঝখান থেকে হয় তো লোক জানাজানি গোলমাল হোত। সুরসুন্দর বাবুকে বোধ হয় অনেকটা দায়ে পড়েই এমন ধারা করতে হয়েছে ।' পিতার কাছে সন্তানের স্নেহের দাবির থেকে সামাজিক সঙ্কীর্ণতা লঘু হয়ে গেছে। সুরসুন্দর বাবুর মহনীয়তা এখানেই প্রমাণিত।

গল্পের শেষলগ্নে এসে সমিতির অন্যতমা সুমিত্রা গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে রেসকোর্সের দিক দিয়ে আসার সময় প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে তার মনে পড়েছে নিজের ব্যক্তিগত স্মৃতি। যেখানে শুধুই আছে না পাওয়ার হতাশ্বাস। ' অনেককাল আগে শীতপাণ্ডুর এমনই এক শুক্লজ্যোৎস্না রাত্রিতে একজনের কাছে নির্জনে বলিয়াছিলেন ··· '' সেই ছোট থেকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলে শেষকালে আমাকে নিলেনা।'' ··· তাহার উত্তরে আর একজন বহুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিয়াছিল, '' এ কথার উত্তর যে কী দেব আমি তা জানিনে সুমিত্রা। কিন্তু আকাশের তারার নীচে আজ এই কথা যে আমাকে বললে সংসারে আর সমস্তই ভুলব, আর সবাই ভুলবে , কিন্তু এ কথা কখনো ভুলতে পারব না ।''

''কিন্তু তাতে আমার দুঃখ পড়বে না চাপা । ''

''সুমিত্রা , তুমি তো সবই জান। বাপ মায়ের একেবারে মত নেই। ''

পিতা-মাতার চাওয়া-পাওয়াকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে নিজস্ব মতামত ভেসে যায়। অপ্রাপ্তির যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে সুমিত্রার মন। সেইসব স্মৃতি শুধু তার সম্পদ হয়ে থাকে। সেদিনের তন্বী কিশোরীর প্রথম যৌবনের দিনগুলি তো জীবনে আর কখনোই ফিরে আসার নয়। বর্তমান জীবনে অনেক বাহুল্য আতিশয্যের মধ্যে তার দিনগুলি যাপিত হতে থাকলেও সেই প্রেম, অনুভূতির আস্বাদ আর কখনই সে পায়নি। একথা সুমিত্রা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে। মনের সেই গোপন প্রকোষ্ঠে সমাজের প্রবেশাধিকার নেই। মঞ্জরী ও নরেশের অবাধ প্রেম বেহায়াপনা বলেই খ্যাত হয় সুমিত্রাদের চোখে । যতই নিন্দা – কলরব গুঞ্জন সমাজের আকাশ বাতাসকে দূষিত করুক না কেন , মঞ্জরীর প্রেম কোন বাধা মানে না , সে অবাধ , চঞ্চল , এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় । এখানেই লেখিকার স্বাতন্ত্র্য । নিজের সময়ের থেকে তিনি অনেক এগিয়ে। এখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠা । 'সকল সার্থক সৃষ্টি আসলে স্রষটার আত্মরচনা । একথা আশালতা দেবীর প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। কোন কোন গল্প তাঁর জীবন- সম্পৃক্ত হলেও পারিপার্শিক জীবন অভিজ্ঞতা পুষ্ট অনেক গল্প কল্পনা ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পর্শে জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে উঠেছে। ' শরৎচন্দ্র ও গলসওয়ার্দ্দি ' প্রবন্ধে আশালতা নিজেই জানিয়েছেন , - '' সাহিত্যের মাঝে নিজের জীবনের গভীর অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার স্থান রয়েছে কিন্তু সেই ত সব নয়; তাকে এমন করে প্রকাশ করা হয়েছে যে , নিখিলের আনন্দ বেদনাকে সে উদবেল করে তুলেছে । বিষয়টা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ; কিন্তু বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে যে আলোক বিকীরণ হচ্ছে সেখানে ব্যক্তির ছায়াপাত নেই, সকলের সৌন্দর্য্যোন্মুখ হৃদয়ক্ষেত্রে সে আন্দোলন তুলেছে। '' লেখিকা অনেকসময় নিজেকেই কল্পনার রঙে ফুটিয়ে তুলেছেন। কল্পনার মধ্য থেকেই আত্মানুসন্ধিৎসু পাঠক নিবিড় জীবন সত্যকে খুঁজে পেতে পারেন। তখনই সার্থক হয়ে ওঠে লেখকের সাহিত্য সৃজন। মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীর বিশ্লেষণ নিয়েই লেখা আশালতা সিঙ্ঘের গল্প। এই ধরনের গল্পের জনপ্রিয়তা চিরকালের।

<u>তথ্যসূত্র</u>

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

আশালতা সিংহ ঃ আশালতা সিংহ রচনাবলী

শম্পা সিনহা ঃ আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক

এখানে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া হল। নিচের লিঙ্কটি দেখো।

https://forms.gle/GKEHtrrRswKsbnmx8